কালের কণ্ঠ

তারিখ : 11 OCT 2015
পৃষ্ঠা : ১৪ কলাম : ৬

বিমল সরকার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারীকরণে সুস্পষ্ট নীতিমালা চাই

স্বাধীনতার পর সত্তরের দশকে একজন বেসরকারি শিক্ষক বা অধ্যাপককে যেখানে 'অনুদান' বাবদ ২০-৩০ টাকা বা ১০০ টাকা প্রদান করা হতো, সেখানে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এখন 'বেতন-ভাতা' হিসেবে দেওয়া হয় স্তরভেদে ১০ হাজার, ২০ হাজার, এমনকি ২৫-৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। কাজেই উপজেলা সদরের স্কুল বা কলেজ, এমনকি দেশের এমপিওভুক্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করার বিষয়টিও এখন আর অলীক কল্পনা বলে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত কম টাকায়ই তা সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার। নীতিমালা কেবল থাকলেই হবে না, সঠিকভাবে এর বাস্তবায়নও হওয়া চাই। উপযুক্ত ও নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতীতের মতো আর যাতে কোনোক্রমেই স্বার্থান্ধতা ও সংকীর্ণতার কোপানলে পড়তে না হয়

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করা ও না করা নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী ও বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তোষ, অন্তর্জ্বালা, বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ-ভোগান্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এই বিড়ম্বনা ও ভোগান্তির সৃষ্টি হয় বিগত শতকে, বিশেষ করে আশির দশকে স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে। এরশাদের পতনের পর নব্বইয়ের দশক থেকে এ পর্যন্ত যথাক্রমে 'গণতান্ত্রিক সরকার', 'ঐকমত্যের সরকার', 'জোট সরকার' ও 'মহাজোট সরকার' এসব নামে অনেকটা পৌনঃপুনিকভাবে যাঁরা দেশ শাসন করেছেন বা এখনো করছেন তাঁদের আমলেও বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের বিড়ম্বনা ও ভোগান্তির মাত্রা কমে তো না-ই, বরং বেড়েছে বা বেড়ে চলেছে অনেক ক্ষেত্রে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের জমানায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সফরের সময় তাঁর আকস্মিক ঘোষণায় অনেক স্কুল ও কলেজ সরকারি করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষ, ঘরদোর, জায়গাজমি, ভৌগোলিক অবস্থান, সর্বোপরি কোনো রকম যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার ধার না ধেরে বলতে গেলে সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কাজটি করা হয় এ সময়। এদিক থেকে বেশির ভাগ উপজেলাই সরকারের সুনজর থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে। বঞ্চিত থাকে ২০, ৩০, এমনকি ৪০ বছর আগে স্থাপিত ও যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা ঐতিহ্যবাহী অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। অন্যদিকে কেবল উপজেলা নয়, এমন অনেক হতভাগা জেলা রয়েছে, যেগুলোতে ৯ বছরে (১৯৮১-১৯৯০) একটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকেও সরকারি করা হয়নি (জেলা সদরের মহিলা কলেজগুলোর কথা ভিন্ন প্রসঙ্গ)। আবার এমনও হয়েছে যে একই উপজেলার একাধিক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যের চাকা নিমেষে ঘুরে গেছে। পাঁচ বছর, তিন বছর, এমনকি মাত্র এক বছর আগে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হলো, ঠিকমতো উঠে এখনো আত্মপরিচয় নিয়ে দাঁড়াতেই পারেনি, সেটিও রাজকীয় ঘোষণার বদৌলতে রাতারাতি সরকারি হয়ে যায়। এখানে কোনটির কথা রেখে কোনটির কথা বলব। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এগুলোতে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক, এমনকি দু-একটি 'যুগান্তকারী' সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও এরশাদের আমলে কেবল অপরিকল্পিতভাবে সরকারীকরণের ফলে বৈষম্য, ক্ষোভ, অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়।

এরশাদের পতনের পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এ সরকারের এক বছর যেতে না যেতেই পূর্বসূরি এরশাদ আমলের মতোই উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়। প্রতি উপজেলায় একটি করে কলেজ সরকারি হবে, নাকি স্কুল; স্কুল হলে কোনটি—বালিকা, না বালক? এসব প্রশ্ন ও আলোচনা দেশের সর্বত্র। ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি বলে ঘোষণাও দেওয়া হয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ন্যাম ভবন (এমপি হোস্টেল), শিক্ষা অধিদপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহ ও ব্যক্তিদের কাছে ছোটাছুটির হিড়িক পড়ে যায়। সরকারীকরণের তালিকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নামটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তো? অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে সেটি আবার কাটা যাবে না তো?—এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে সংশ্লিষ্টদের মনে। অনেক প্রতিষ্ঠান বিষয়টি তদারকির জন্য কমিটি গঠন করে ঢাকায় প্রেরণ করে। নিজেরা চাঁদা দিয়ে আর্থিক তহবিল তৈরি করে তারা। নিজেদের খরচপাতি ছাড়াও এ বাবদ কোথাও কোথাও নগদ টাকাকড়িও দিতে হয়। সব কিছু বিবেচনায় বলা যায়, এ যেন এক তেলেসমাতি কারবার! দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ অন্য সব কর্মকর্তা, সরকারি দলের কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরের নেতাদের এ বিষয়ে মাঠে-ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতাও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে তোলে ও একই সঙ্গে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। কিন্তু কোনো রকম নীতিমালা প্রণয়ন না করে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের বিষয়টি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও সুধীসমাজে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হওয়ায় সরকার হঠাৎ করে তা স্থগিত রাখে। এভাবেই শেষ হয় খালেদা জিয়ার প্রথম মেয়াদকাল।

শেখ হাসিনা সরকারের প্রথম (১৯৯৬-২০০১) ও খালেদা জিয়া সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে (২০০১-২০০৬) বিচ্ছিন্নভাবে দু-চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি করা হলেও বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসেনি। কিন্তু শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের (২০০৯-২০১৩) শেষ দিক থেকে বিষয়টি আবারও ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তাঁর আমলে গত পাঁচ-ছয় বছরে দফায় দফায় বেশ কিছু স্কুল ও কলেজকে সরকারি করা হয়। জনশ্রুতি আছে যে এ ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু কোনো নীতি অনুসরণ না করে এলাকাভেদে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও প্রভাবশালীদের ইচ্ছাপূরণের বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইদানীং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের জোর তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে এ বিষয়ে একেকবার একেক রকম খবর পাওয়া যায়। জানা যায়, বর্তমান সরকারের মেয়াদে বেসরকারি সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি করা হবে। অন্যদিকে এ-ও জানা যায়, যেসব উপজেলায় কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে একটি স্কুল ও একটি কলেজ সরকারি করা হবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা সদরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী কলেজ ও পাইলট স্কুলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত আগ্রহ ও নির্দেশে গত মাসে (আগস্ট) তড়িঘড়ি এসব প্রতিষ্ঠানের 'প্রোফাইল' তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের নামে কোথাও কোথাও মতলববাজিও শুরু হয়ে গেছে। মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণির অসাধু কর্মচারী 'দ্রুত ও সহজে চিঠি পাইয়ে দেবেন' কিংবা 'তালিকার অপেক্ষাকৃত নিচের ক্রমিক থেকে নামটি ওপরের ক্রমিকে এনে দেবেন'—এসব অজুহাতে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে দরদাম শুরু করে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান বিশেষে শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে লাখ লাখ টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির খবর পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে। অবশ্য সব খবর সব সময় জনসমক্ষে আসে না।

স্বাধীনতার পর সত্তরের দশকে একজন বেসরকারি শিক্ষক বা অধ্যাপককে যেখানে 'অনুদান' বাবদ ২০-৩০ টাকা বা ১০০ টাকা প্রদান করা হতো, সেখানে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এখন 'বেতন-ভাতা' হিসেবে দেওয়া হয় স্তরভেদে ১০ হাজার, ২০ হাজার, এমনকি ২৫-৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। কাজেই উপজেলা সদরের স্কুল বা কলেজ, এমনকি দেশের এমপিওভুক্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করার বিষয়টিও এখন আর অলীক কল্পনা বলে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত কম টাকায়ই তা সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার। নীতিমালা কেবল থাকলেই হবে না, সঠিকভাবে এর বাস্তবায়নও হওয়া চাই। উপযুক্ত ও নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতীতের মতো আর যাতে কোনোক্রমেই স্বার্থান্ধতা ও সংকীর্ণতার কোপানলে পড়তে না হয়। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ার পাশাপাশি শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তোষ ও হতাশার পরিমাণও বাড়তে থাকে। ক্ষোভ ও অসন্তোষের বিস্তার ঘটে জনমনেও।

লেখক : কলেজ শিক্ষক
bimalsarker59@gmail.com